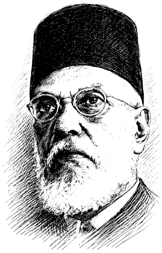

লেখক পরিচিতি

সৈয়দ এম্‌দাদ আলী (১লা আশ্বিন ১২৮২ বঙ্গাব্দ) তৎকালীন বিক্রমপুর পরগনা, বর্তমান মুন্সীগঞ্জে জন্মগ্রহণ করেন। কথিত আছে তাঁর প্রপিতামহ বাংলার ৩৬০ আউলিয়ার একজন, যিনি হযরত শাহজালালের সঙ্গী হয়ে ইরাক থেকে বাংলাদেশে এসেছিলেন।

১৯০৩ সালে তিনি ইণ্ডিয়ান ইম্পেরিয়াল পুলিশে সাব-ইন্সপেক্টর হিসাবে যোগ দেন। তাঁর কর্মনিষ্ঠার স্বীকৃতি স্বরূপ ব্রিটিশ সরকার তাঁকে খানসাহেব উপাধিতে ভূষিত করেন।

১৯০৩ সালে তিনি *নবনূর* পত্রিকা সম্পাদনা ও প্রকাশ শুরু করেন। পত্রিকার সম্পাদকীয়তে তিনি লেখেন, “সাহিত্য চর্চার মাধ্যমেই অনগ্রসর মুসলিম সমাজের প্রকৃত উন্নতি সম্ভব।”

বাংলা ভাষায় ঈদ বিষয়ক প্রথম কবিতা যেমন তাঁর লেখা, তেমনি ঈদসংখ্যা প্রচলনের কৃতিত্বও তাঁর। ১৯০৩ সাল থেকে পরপর ৩ বছর তিনি *নবনূর*

পত্রিকার ঈদসংখ্যা প্রকাশ করেন।

বাঙালী মুসলমানদের ধর্মীয় পরিচয়কে স্মরণে রেখে সাহিত্য রচনার প্রতি তিনি গুরুত্ব দিতেন। বলেছেন, "সর্ব প্রথমে ভাবের বিপ্লব ঘটাইবার জন্য আপনারা সাহিত্য সৃষ্টি করিবেন, কিন্তু নিজেদের তালিম ও তমদ্দুনের দিকে দৃষ্টি রাখিয়াই আপনাদের কাজ করিতে হইবে।" বাংলা ভাষায় অতিরিক্ত সংস্কৃতায়ন যেমন তিনি পছন্দ করতেন না, তেমনি অনাবশ্যক আরবী-ফার্সী শব্দ ব্যবহারকেও পরিহার করতেন।

সৈয়দ এম্‌দাদ আলী বেঙ্গল মুসলিম রেনেসাঁর অন্যতম প্রতিনিধি। ১৯৫৬ সালের ৩রা ডিসেম্বর তিনি মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর মৃত্যুর পর আহমদ শরীফ একটি প্রবন্ধে লেখেনঃ "আমাদের নজরুল-পূর্ব যুগের সাহিত্য-প্রচেষ্টা সম্বন্ধে বলা চলে, সেখানে সার্থক সাহিত্য-সৃষ্টি বিরল। কিন্তু তারা উত্তরপুরুষ ও উত্তরসাধকের জন্যে যে-ক্ষেত্র কর্ষণ ও তৈরী করে রাখলেন, তার যথার্থ মূল্য নিরূপিত হলে একদিন আমরা শ্রদ্ধায় ও বিস্ময়ে অভিভূত হবো—এ নিশ্চিত জানি।"

বেঙ্গল
মুসলিম
রেনেসাঁ
সিরিজ

তাপসী রাবেয়া

ভূতপূর্ব নবনূর সম্পাদক
সৈয়দ এম্‌দাদ আলী প্রণীত

প্রথম প্রকাশকাল
১৩২৪ বঙ্গাব্দ ॥ ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দ

বই-পরিচিতি

বেঙ্গল মুসলিম রেনেসাঁ সিরিজ-এর দ্বিতীয় বই “তাপসী রাবেয়া”। উনবিংশ শতাব্দীতে [১৮০০-১৯০০] ইউরোপীয় বিদ্যা ও প্রযুক্তির অভিঘাতে বাংলায় যে বুদ্ধিবৃত্তিক জাগরণ ও কর্মকোলাহল সূচিত হইয়াছিল, আর উহাতে বঙ্গীয় মুসলমান কবি-শিল্পী-সাহিত্যিক-চিন্তাবিদের যে অংশগ্রহণ ঘটিয়াছিল, তাহার নির্বাচিত কিছু টেক্সট একবিংশ শতকের পাঠকের কাছে নতুনভাবে, নতুন অবয়বে হাজির করাই বেঙ্গল মুসলিম রেনেসাঁ সিরিজ-এর উদ্দেশ্য।

এই গ্রন্থের লেখক ভূতপূর্ব্ব “নবনূর” পত্রিকার সম্পাদক, বাংলাদেশে ঈদসংখ্যা প্রকাশের প্রবর্তক সৈয়দ এমদাদ আলী (১৮৭৫-১৯৫৬)। এই গ্রন্থে তিনি ইরাকের বস্‌রা নিবাসী দরিদ্র এক দাসীকন্যা কেমন করিয়া দুঃখ-বিপদ পাড়ি দিয়া জ্ঞান ও প্রজ্ঞার শীর্ষস্থানে পৌঁছাইলেন, সৃষ্টিকর্তার ধ্যান ও সাধনায় সিদ্ধি লাভ করিয়া জগৎ-বিখ্যাত হইলেন, তাহাই অতি মনোরম ভাষায় বর্ণনা করিয়াছেন। পাশাপাশি ইসলামে সুফীতত্ত্ব-দর্শনের উৎপত্তি ও বিকাশের বিষয়েও তিনি এই পুস্তকে সংক্ষেপে আলোচনা করিয়াছেন। সংক্ষিপ্ত এই আলোচনায় আধ্যাত্মিক সাধনা, মানব-আত্মা, প্রেম, ত্যাগ ও ঈশ্বরানুসন্ধানের প্রশ্নও বিশ্লেষিত হইয়াছে। সূচীপত্র অনুযায়ী গ্রন্থটি দুই অংশে বিন্যস্ত—

প্রথম অংশে জীবনকথা, দ্বিতীয় অংশে সুফীতত্ত্ব। গ্রন্থটির প্রথম প্রকাশকাল ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দ।

সূচীপত্র

প্রথম পর্ব : ১ম–১১শ অধ্যায়

জীবন-কথা ১৩–৬১

দ্বিতীয় পর্ব : ১২শ–১৬শ অধ্যায়

সুফীতত্ত্ব ৬৩–৯৪

নির্ঘণ্ট ৯৫

প্রথম পরিচ্ছেদ

বহুদিন পূর্ব্বে বস্‌রার গোলাব-কুঞ্জে একটা সুগন্ধ গোলাব ফুল ফুটিয়াছিল। দরিদ্রের উদ্যানের গোলাব হইলেও আল্লা তাহাতে এত সৌরভ ঢালিয়া দিয়াছিলেন যে, আজ দ্বাদশ শত বৎসর পরেও তাহার সুবাস ও সৌন্দর্য্যে বিশ্ব ভরপুর হইয়া আছে এবং ভক্ত নরনারীগণ তাঁহার কথা অতি সম্ভ্রমের সহিত উচ্চারণ করিতেছেন। বস্‌রার সেই শ্রেষ্ঠ গোলাবটিই জগৎ-বরেণ্যা তাপসী রাবেয়া।

যাঁহারা জগতের নানা জাতির ধর্ম্মের ইতিহাস আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহারা দেখিয়াছেন যে জগতের মঙ্গল কামনায় যাঁহারা নিজ জীবন উৎসর্গ করিয়া শেষে অনির্ব্বচনীয় আনন্দ লাভে সক্ষম হইয়াছেন এবং শ্রেষ্ঠ ধর্ম্মজীবন দ্বারা জগতের দুঃখ ও পাপ বহুল পরিমাণে লাঘব করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন, তাঁহাদের প্রায় সকলেই দরিদ্র মাতা-পিতার সন্তান। দারিদ্র্যের ক্লেশই তাঁহাদের চিত্তকে খোদাতা'লার দিকে আকৃষ্ট করিতে সক্ষম হয় এবং এই কারণেই রাবেয়ার জীবনে ধর্ম্মের এইরূপ সর্ব্বাঙ্গসুন্দর বিকাশ পরিলক্ষিত হইয়াছিল।

রাবেয়ার পিতা ইস্‌মাইল দরিদ্র কিন্তু ধর্ম্মপ্রাণ ছিলেন। তাঁহাকে সর্ব্বদাই নানা প্রকার অভাবের সহিত যুদ্ধ করিতে

হইত। এমন কত দিন গিয়াছে যে তাঁহাদের আহার হয় নাই, এমন কত রাত্রি গিয়াছে যে তৈলের অভাবে তাঁহাদের গৃহে আলো জ্বলে নাই। যে দিন রাবেয়ার জন্ম হয়, সে দিনও ঘরে তৈল ছিল না। দরিদ্র হইলেও রাবেয়ার পিতা পরমুখাপেক্ষী ছিলেন না। স্ত্রীর কথা মত তিনি কিছু ছিন্নবস্ত্র ও তৈল সংগ্রহের জন্য প্রতিবেশীদের দ্বার পর্যন্ত গিয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন, তাহা চাহিয়া আনিবার ইচ্ছা তাঁহার হইল না। অতএব রাজপুত্র বা রাজকন্যার জন্মের মত তাঁহার জন্মে কোন উৎসব হয় নাই, কোন রাজকবি তাঁহার বন্দনাগীত গায় নাই,—অতি অখ্যাত অজ্ঞাত ভাবেই এক অতি দীন-দরিদ্রের কুটীরে তাঁহার জন্ম হইয়াছিল। কিন্তু তাহা হইলে কি হয়? আল্লা যাঁহাকে বড় করিতে চাহেন, তাঁহাকে তিনি নির্জ্জনতা হইতে জনতার মধ্যে টানিয়া আনেন, অন্ধকার হইতে শোভা-সৌন্দর্য্যময় আলোকের জগতে উপস্থিত করিয়া দেন। পৃথিবীর মানুষ আমরা তাহা জানিবারও অবসর পাই না। কিন্তু যখন সত্যই রহমান ও রহিম তাঁহাকে টানিয়া লইয়া সকলের অলক্ষিতে গৌরবের আসনে বসাইয়া দেন, তখনই তাহা দেখিয়া আমরা বিস্ময়ে-পুলকে আত্মহারা হই।

তাপসী রাবেয়ার জন্মের সহিত এক অতি আশ্চর্য্য কাহিনী জড়িত আছে। তাঁহার পিতা যখন প্রতিবেশীর দ্বার পর্য্যন্ত গিয়া কিছু না চাহিয়াই ফিরিয়া আসিলেন, তখন তিনি নিজের মন্দ অদৃষ্টকে শত ধিক্কার দিতে লাগিলেন। কিন্তু মানুষ যখন চিন্তায় ও যাতনায় মুহ্যমান হইয়া পড়ে, তখন সর্ব্বসন্তাপহারিণী নিদ্রাই তাহার পদ্ম-হস্ত বুলাইয়া সেই ভাবনা ও যাতনার অবসান করে। আজ রাবেয়ার ক্লিস্টচিত্ত পিতাকে সেই নিদ্রাই নিজ কোলে আশ্রয় দিয়া অন্ততঃ ক্ষণিকের জন্যও সকল দুঃখ বিস্মৃত হইতে অবসর দান করিল।

তখন রজনী গভীরা। জীবজগৎ নিদ্রার কোলে অচেতন। উপরে তারকাখচিত নিশীথ আকাশ, নীচে বিপুলায়তনা পৃথ্বী আপনার দেহ বিস্তৃত করিয়া রহিয়াছে এবং প্রকাণ্ড দেহ দৈত্যের মত অন্ধকার তথায় রাজত্ব করিতেছে। ঝিল্লীর নহবত ও দূরস্থিত সারমেয়ের রব কেবল সেই নৈশ নিস্তব্ধতা ক্ষণে ক্ষণে ভঙ্গ করিতেছে এবং বৃক্ষপত্রের মধ্য দিয়া বায়ুর সর-সর ধ্বনি কদাচিত শ্রুত হওয়া যাইতেছে।

এমনি সময়ে রাবেয়ার পিতা এক মনোহর স্বপ্ন দেখিলেন। তিনি দেখিলেন, তাঁহার দরিদ্রকুটীর আজ ধন্য হইয়াছে! পবিত্র আলোক ও শত সৌরভে সে গৃহ আজ ভরিয়া গিয়াছে! এবং সেই আলোক ও সৌরভের মধ্যে দাঁড়াইয়া হজরত মোহাম্মদ (দঃ)। সেই পবিত্র পুরুষ যেন রাবেয়ার পিতার প্রতি প্রসন্নদৃষ্টিতে চাহিয়া আছেন এবং তাঁহার নয়ন ও বদন হইতে করুণার জ্যোতিঃ ক্ষরিত হইতেছে। মহাপুরুষ তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—

> “বৎস, কেন তুমি এরূপ বিষণ্ণ হইয়াছ? তোমার এই কন্যা উত্তরকালে ধর্ম্মজগতে বহু পুরুষ সাধকের সমকক্ষা হইবে এবং তাহার যশঃ-সৌরভ বস্‌রার শ্রেষ্ঠ গোলাবের ন্যায় দিকে দিকে সুগন্ধ বিতরণ করিবে। তোমার কোন চিন্তার কারণ নাই। দারিদ্র্যের জন্য ম্রিয়মাণ হইও না, খোদাই তোমার দুঃখের অবসান করিবেন।—এই কন্যা হইতে তোমার বংশ চিরস্মরণীয় হইবে। বস্‌রার আমীর গত শুক্রবার তাঁহার নিয়মিত দরূদ পাঠ করিতে ভুলিয়া গিয়াছিলেন। তুমি তাঁহাকে ইহা স্মরণ করাইয়া দিয়া বলিবে যে, আমি তাঁহার সেই ত্রুটীর প্রতিদান স্বরূপ তোমাকে চারিশত দিনার দিতে

বলিয়াছি। আমীর ধর্ম্মপ্রাণ, তিনি তোমাকে কখনই প্রত্যাখ্যান করিবেন না।”

হজরত ইহা বলিয়া অন্তর্হিত হইতেই রাবেয়ার পিতার নিদ্রা ভাঙ্গিয়া গেল। তিনি এই আশ্চর্য্য স্বপ্ন দেখিয়া বিস্ময়ে ও পুলকে কিছুকাল নির্ব্বাক হইয়া রহিলেন। তাঁহার মনে হইল, তাঁহার দীন-কুটীর যেন তখনও স্বর্গীয় সুবাসে পূর্ণ রহিয়াছে। যখন তাঁহার সংজ্ঞা ফিরিয়া আসিল, তখন তিনি হজরতের করুণায় মোহিত হইয়া খোদার অশেষ গুণানুবাদ করিলেন এবং রাত্রি প্রভাত হইলে, স্বপ্নের সত্যতা পরীক্ষা করিবার জন্য আমীরের নিকটে উপস্থিত হইয়া তাঁহার বক্তব্য নিবেদন করিলেন।

আমীর স্বপ্ন-বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া নিজের ভ্রম বুঝিতে পারিলেন, এবং হজরত যে তাঁহার প্রতি কৃপা করিয়া এইরূপে তাঁহার ক্রুটীর বিষয় তাঁহাকে জানাইয়াছেন, তজ্জন্য একান্ত মনে প্রার্থনা করিলেন এবং রাবেয়ার পিতাকে চারিশত দিনার এবং দরিদ্রদের মধ্যে দশ সহস্র দেরম বিতরণ করিতে আদেশ প্রদান করিলেন।

এই অর্থাগমে রাবেয়ার পিতার বিশেষ উপকার হইয়াছিল। তিনি এতদ্দ্বারা নিজ পরিবারের দারিদ্র্য-ক্লেশ দূর করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন এবং ইহার ফলে সকলের মুখেই আনন্দের ও তৃপ্তির হাসি ফুটিয়া উঠিয়াছিল।

রাবেয়ার জন্মকাল হইতে তাঁহাদের পারিবারিক অবস্থার পরিবর্ত্তন হওয়ায়, তিনি মাতার স্নেহে, পিতার আদরে ও ভগিনীদের যত্নে দিন দিন বর্দ্ধিত হইতে লাগিলেন।

রাবেয়ার পূর্ব্বে এই পরিবারে আর তিনটি কন্যা জন্ম-গ্রহণ করিয়াছিল। অতএব রাবেয়া তাঁহার পিতার চতুর্থ সন্তান।

আরবীতে “রাবা” শব্দে চতুর্থ বুঝায়। সম্ভবতঃ তিনি তাঁহার পিতার চতুর্থ সন্তান বলিয়াই তাঁহার এই নামকরণ হইয়াছিল।

বালিকা রাবেয়া হাসিয়া খেলিয়া দিন কাটাইতে লাগিলেন। যে ধর্ম্মের আহ্বান তাঁহাকে পরবর্ত্তী জীবনে আকুল করিয়া তাঁহার সমস্ত সাধনা-কামনা আল্লার উদ্দেশ্যে অবিচলিত হৃদয়ে অর্পণ করিতে প্রবুদ্ধ করিয়াছিল, তখনও সে আহ্বান আসিয়া পঁহুছে নাই।

কিন্তু যাঁহারা ইতিহাসের সহিত সুপরিচিত, তাঁহারা জানেন যে, ধর্ম্মের জন্য যাঁহারা আত্ম-দান করিয়া চিরস্মরণীয় হইয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের অধিকাংশের জীবনই অবিরাম দুঃখ-কষ্টের মধ্য দিয়া যুদ্ধ করিতে করিতে পরিশেষে সর্ব্ববাঞ্ছনীয় সিদ্ধিস্থানে গিয়া পঁহুছিয়াছে। রাবেয়ার জীবনেও তাহার ব্যতিক্রম হয় নাই।